ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. XI, No. 2, JULY 2023 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

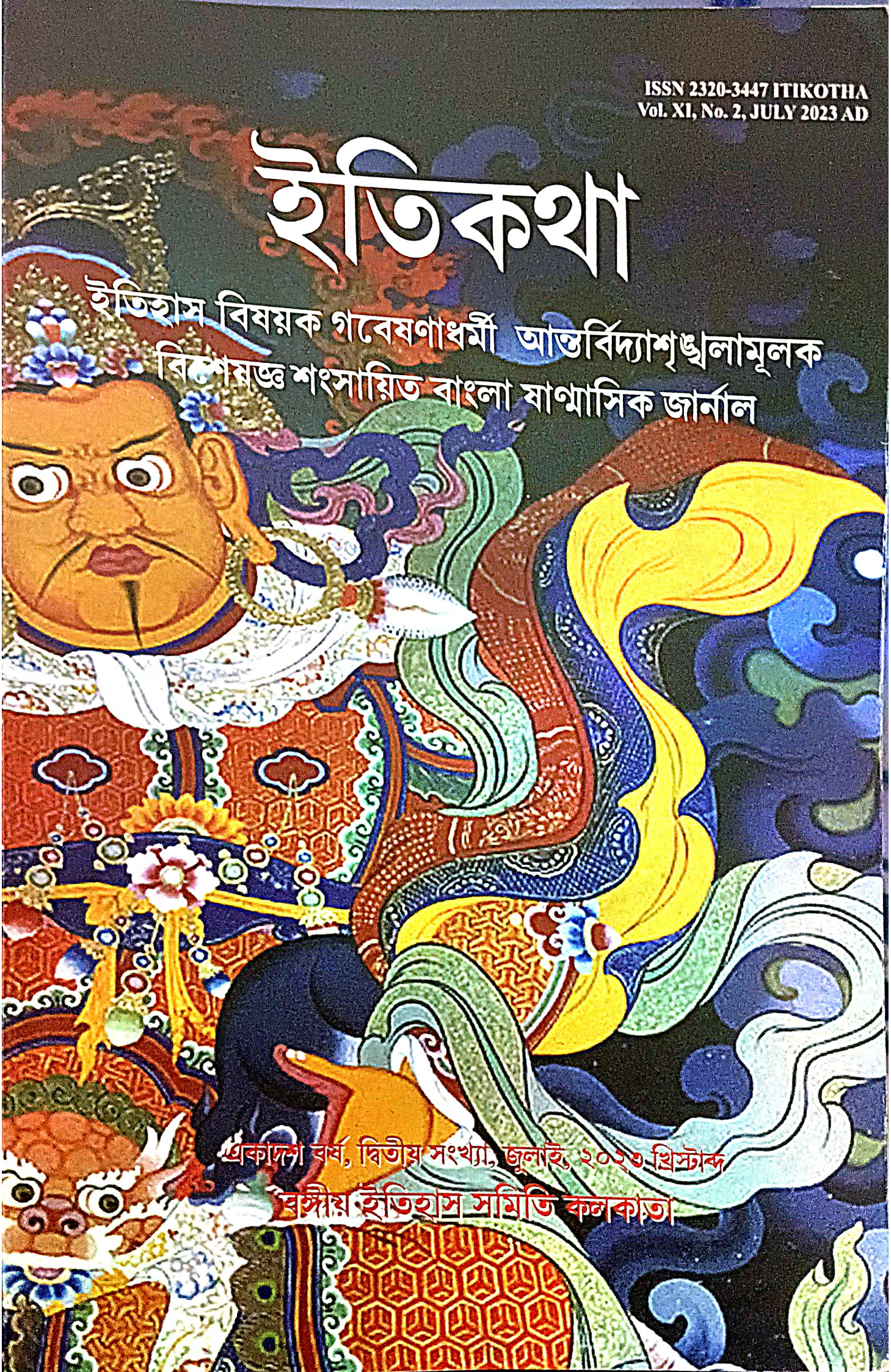

একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ITIKOTHA

An interdisciplinary Half Yearly Research Oriented
Referred Journal of History in Bengali

ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. XI, No. 2, July 2023 AD

© Bangiya Itihas Samiti Kolkata

Website
www.bangiyaitihas.in

E-mail
bangiyaitihas@gmail.com

Price: 200/-

The publication of this journal has been financially supported by the Indian Council of Historical Research. The responsibility for the facts stated or opinions expressed is entirely of the author and not of the ICHR.

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ কর্তৃক
কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত

বর্ণ-সংস্থাপন
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রণ
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

গ্রন্থস্বত্ব
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. XI, No. 2, July 2023 AD

সম্পাদকীয় ৯

বিশেষ প্রবন্ধ

রণজিৎ গুহ ও তাঁর সাব-অলটার্ন স্টাডিজ
রঞ্জিত সেন ১১

প্রবন্ধ

ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী: ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন চর্চা
আনন্দ ভট্টাচার্য ২৫

কুম্ভ: সাহিত্যে ভারততীর্থের সন্ধান
অনামিকা মুখার্জী ৪৬

বাংলা ভাষায় কোরআন ও ইসলামচর্চায় এক বিস্মৃত মনীষী: ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
আরিফুর রহমান মোল্লা ৭০

ভারতে জীবন ও জীবিকায় চৈতন্যধর্মের প্রভাব (ষোড়শ শতক-বিশ শতক)
অসীম বিশ্বাস ১০৪

ধূমকেতু থেকে *লাঙল*: কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন
মিঠুন ব্যানার্জী ১২৮

বাংলার প্রান্তিক সমাজ: প্রান্তিক মুসলমান
মৃত্যুঞ্জয় পাল ১৫২

বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় শুদ্ধ ও মিশ্রপন্থী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও দ্বন্দ্ব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০১-১৯৪৯ খ্রি.)
বিপ্লব রায় ১৭৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় জাতীয়তাবাদ: ফিরে দেখা
দেবাশীষ পাল ১৯৭

গ্রন্থ সমালোচনা

ঐতিহাসিক আর মানবাধিকার কর্মীর দায়িত্ব পালন
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ২৩২

ইতিকথা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ২, জুলাই ২০২৩ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১২৮-১৫১
www.bangiyasiksas.in

প্রবন্ধ

ধূমকেতু থেকে লাঙল: কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন

মিঠুন ব্যানার্জী*

(প্রাপ্ত: ২৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি., গৃহীত: ২৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় ফেরার পর একথা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর বন্দুক নয় তাঁর কলমই প্রধান অস্ত্র হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রাথমিকভাবে দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের অবগত করতে বিভিন্ন পত্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লেখা শুরু করেন। *নবযুগ* পত্রিকার পর নজরুল নিজের সম্পাদনায় ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে দেশবাসীকে পরাধীনতার গ্লানির সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। এই পত্রিকা দেশের যুবসম্প্রদায়, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি করেছিল। নজরুল এই পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার থেকে মুক্ত হয়ে দেশবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথপ্রদর্শন করেছিলেন। এই পত্রিকাতে প্রকাশ্য ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে তাঁর কারাদণ্ড হয়। নজরুলের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে অনেকাংশে পরিণত করে তুলেছিল। নজরুল কারাগারে থাকাকালীন রাজনৈতিক বন্দীদের কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শে আসার মধ্য দিয়ে নজরুল উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হলেও, তা প্রকৃতপক্ষে দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ভেবরা থানা শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: banerjee60mithun@gmail.com

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন হবে না। অসাম্যযুক্ত সমাজজীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই নজরুল কারাগার থেকে মুক্তির পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি সাম্যবাদী সমাজজীবনের আবশ্যিকতার কথাও প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই চেতনা বাস্তব রূপ লাভ করেছিল যে পত্রিকার মধ্য দিয়ে, তা ছিল *লাঙল*। এই পত্রিকাতে প্রকাশিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধগুলি মূলত ছিল সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক রচনা। নজরুল এই পত্রিকার মাধ্যমে বলেন যে, দেশের সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সমাজ এগিয়ে চলে। তাদের ওপর শোষণ চালায় যে মহাজন, জমিদার, পুঁজিপতিরা তাদের শোষণ ও বিদেশি শাসকদের শোষণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাই ব্রিটিশ শাসকদের পাশাপাশি এই দেশীয় শোষকদের শোষণের সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য তিনি *লাঙল* পত্রিকাকে হাতিয়ার করেছিলেন। *ধূমকেতু* থেকে *লাঙল* পত্রিকা পর্যন্ত আসতে আসতে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তার এই বিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এই বিবর্তনকে চিহ্নিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচকশব্দ

সাম্রাজ্যবাদ, *ধূমকেতু*, *লাঙল*, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শোষণ, সাম্যবাদী সমাজ, কারাদণ্ড, বিবর্তন, রাজনৈতিক চিন্তা।

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি রূপে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর জীবনধারণের উপায় ছিল কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিকে তিনি কেবলমাত্র জীবিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি এই কাজের মাধ্যমে বৃহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা তাঁর সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবনে চালিয়েছিলেন। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আহরণ করতেন যে বিষয়টি থেকে, তা ছিল 'রাজনীতি', এবং এই রাজনীতি ছিল সমকালীন যুগধর্ম অনুসারে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মযজ্ঞ। কাজী নজরুল ইসলামও এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। তিনি সৈনিক জীবন শেষে নৌশেরা থেকে কলকাতাতে ফিরেছিলেন যে রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে, তা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উৎখাত করার লক্ষ্যে স্থির ছিল। সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে ব্যবহার করতেন। জাগরণী গান, দেশাত্মবোধ গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করতেন। এই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে পরাধীন ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে চাইতেন, তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে চাইতেন। দেশের মানুষের মধ্যে থেকে ভয়-ভীতি দূর করে তাদের ব্রিটিশ

শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করতে চাইতেন। নজরুল তাঁর এই চিন্তাভাবনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধূমকেতু ও লাঙল পত্রিকাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ধূমকেতু প্রকাশিত হয়েছিল ১১ আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নজরুল কারারুদ্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। কারাগার থেকে মুক্তির পর নজরুল যে পত্রিকার মাধ্যমে নিজের মতামত কবিতা, গান, প্রবন্ধের আকারে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করতেন, তা ছিল লাঙল। লাঙল প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ এপ্রিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পত্রিকার মাধ্যমে যে সমস্ত ভাবনাচিন্তা নজরুল প্রকাশ করতেন তা ধূমকেতু পত্রিকাতে প্রকাশিত নজরুলের ভাবনাচিন্তার থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র ছিল। নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ওপরে কারাজীবনের প্রভাব এই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়। লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের লেখাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। তিনি ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাই তাঁর চিন্তাভাবনা তাঁর কারাজীবন-পরবর্তী কালে ক্রমশ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন মুক্তির পাশাপাশি সমাজজীবনের সামগ্রিক শোষণমূলক ব্যবস্থার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রয়োজনীয়তার ভাবনার দ্বারা পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল।

ধূমকেতু পত্রিকায় কাজী নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রকাশ

নজরুল তাঁর সমকালীন যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিটি ঘটনাতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া কবিতা, গান অথবা প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করলেও সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রকাশের স্বাধীন মাধ্যমের অন্বেষণে ছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট নিজের সম্পাদনায় ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে নজরুল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরোধিতার প্রকাশ্য জগতে এসে উপস্থিত হন। নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তের ভাষায়, 'ধূমকেতু পত্রিকায় নজরুল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রাজনীতির প্রকাশ্য আঙিনায় এসে হাজির হলেন।'[১] ধূমকেতু-র প্রথম সংখ্যায় 'সারথির পথের খবর' শিরোনামে তিনি লেখেন, 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে ধূমকেতুকে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি, আমায় পথ দেখাবে সত্য... রাজভয়-লোকভয় কোন ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না।'[২] কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন ভারতবর্ষে ধূমকেতু চড়ে এসে প্রলয় আনতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের

শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করতে চাইতেন। নজরুল তাঁর এই চিন্তাভাবনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য *ধূমকেতু* ও *লাঙল* পত্রিকাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। *ধূমকেতু* প্রকাশিত হয়েছিল ১১ আগস্ট, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নজরুল কারারুদ্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। কারাগার থেকে মুক্তির পর নজরুল যে পত্রিকার মাধ্যমে নিজের মতামত কবিতা, গান, প্রবন্ধের আকারে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করতেন, তা ছিল *লাঙল*। *লাঙল* প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ এপ্রিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পত্রিকার মাধ্যমে যে সমস্ত ভাবনাচিন্তা নজরুল প্রকাশ করতেন তা *ধূমকেতু* পত্রিকাতে প্রকাশিত নজরুলের ভাবনাচিন্তার থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র ছিল। নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ওপরে কারাজীবনের প্রভাব এই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়। *লাঙল* পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের লেখাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। তিনি ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাই তাঁর চিন্তাভাবনা তাঁর কারাজীবন-পরবর্তী কালে ক্রমশ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন মুক্তির পাশাপাশি সমাজজীবনের সামগ্রিক শোষণমূলক ব্যবস্থার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রয়োজনীয়তার ভাবনার দ্বারা পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল।

ধূমকেতু পত্রিকায় কাজী নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রকাশ

নজরুল তাঁর সমকালীন যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিটি ঘটনাতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া কবিতা, গান অথবা প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করলেও সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রকাশের স্বাধীন মাধ্যমের অন্বেষণে ছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট নিজের সম্পাদনায় *ধূমকেতু* পত্রিকা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে নজরুল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরোধিতার প্রকাশ্য জগতে এসে উপস্থিত হন। নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তের ভাষায়, '*ধূমকেতু* পত্রিকায় নজরুল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রাজনীতির প্রকাশ্য আঙিনায় এসে হাজির হলেন।'[১] *ধূমকেতু*-র প্রথম সংখ্যায় 'সারথির পথের খবর' শিরোনামে তিনি লেখেন, 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে ধূমকেতুকে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি, আমায় পথ দেখাবে সত্য... রাজভয়-লোকভয় কোন ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না।'[২] কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন ভারতবর্ষে ধূমকেতু চড়ে এসে প্রলয় আনতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের

বিরুদ্ধে মহাপ্রলয় এনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে। ধূমকেতুর উদয় প্রলয়ের পূর্বাভাস বয়ে আনে বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি লেখেন, 'শুনেছি নাকি ঝগড়ার আদি নারদমুনি ঢেঁকিতে চড়ে স্বর্গ হতে আসতেন... আমি মনে করি, এই ধূমকেতুই ছিল তাঁর ঢেঁকি বা অগ্নিরথ। কেন না ধূমকেতুর উদয় হলেই ... বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মহাপ্রলয় আনে ... এই 'ধূমকেতু' ঝগড়া বিবাদ আনবে না, তবে প্রলয় যদিও আনে, তা হলে সেটার জন্য দায়ী ধূমকেতুর দেবতা, সারথি নয়। এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।... প্রলয় আনার যে দুর্দম অসমসাহসিকতা, 'ধূমকেতু' যদি তা আনতে পারে, তবে তাতে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই আনবে বেশী।'[৩] এভাবে *ধূমকেতু*-র প্রথম সংখ্যাতেই কাজী নজরুল পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে যে মঙ্গল দেশবাসী অর্জন করবে, তার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যই তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম অমঙ্গল বয়ে আনার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

ধূমকেতু-র এই প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল আরেকটি কবিতা প্রকাশিত করেছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য জনসমক্ষে আনার জন্য। এই *ধূমকেতু* কবিতাতে তিনি লিখেছিলেন—

> 'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
> এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।'[৪]

তিনি এর মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন যে, ধূমকেতু এক অবিনশ্বর শক্তি, যা যুগে যুগে অত্যাচার-অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য ফিরে আসে। চিরনিয়ন্ত্রণহীন এই শক্তি স্রষ্টার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকে। ধূমকেতুর লেজে যে আগুন থাকে তার তেজে সে নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত বিধাতাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের তথা ব্রিটিশ আইনকানুনের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশ মাধ্যমে সেই বিজাতীয় শাসনের অবসানকল্পে এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধের কর্মসূচির আভাস কবি দিয়েছিলেন এই কবিতার মধ্যে।

ধূমকেতু-র পরবর্তী প্রতিটি সংস্করণেই নজরুল তাঁর ব্রিটিশ সরকার বিরোধতার ধারা অব্যাহত রাখেন। পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণে নজরুলের 'জাগরণী' গানটি প্রকাশিত হয়। এই গানের মাধ্যমে নজরুল ভারতবাসীর সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'বন্দিনী মায়ের' 'কোটি বীর-সুত'-র আত্মত্যাগের গাথা তিনি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে দেশবাসীকে 'পুরুষ-সিংহ' 'সত্যমানব' করে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশবাসীর অন্তরে যে সত্য-সুন্দর ঈশ্বরের বাস তাঁকে কবি জাগরিত করতে চেয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ ভারতবাসীর 'আজাদ মুক্ত আত্মাকে ভীরুতা শিখিয়ে তাদের দাস করে রেখেছে'—এই সত্য নজরুল এই কবিতার মাধ্যমে জনগণের কাছে উন্মোচিত করেছিলেন তাদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য। তাই তিনি লেখেন—

'আল্লায় ওরে হক্ তালায়
পায় ঠেলে যায় অবহেলায়
আজাদ মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা
করিছে দাস
সে'ই আজ ভগবান তোমার
সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ।'[৫]

এই সংস্করণে 'কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নজরুল। এই প্রবন্ধেও দেশবাসীকে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ও আত্মত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানান, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিতাড়নের জন্য আত্মত্যাগ প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'তোমরা চাচ্ছ স্বরাজ, অর্থাৎ স্বাধীনতা, অর্থাৎ কিনা বাঙলা করে বলতে গেলে বোঝায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরদের ও-ই সাত সমুদ্দুর তের নদী পার করে, তেপান্তরের মাঠে খেদিয়ে থুয়ে আসা। কথাটা শুনতে খুব মিষ্টি ... আর যে সে কথা বলে তাকে ও ড্যাং-তুলো করে ... বোধনের বাজনা বাজিয়ে দিই যে, ভগবান এসেছেন। কিন্তু এই ভগবান যখন বলেন যে, দেশের পায়ে তোমাদের স্বার্থকে বলিদান দাও, অমনি তোমাদের বলকে ওঠা ভক্তি দুগ্ধ ছিঁড়ে এমনই টক দই হয়ে ওঠে যে, কার বাবার সাদ্ধি তা জিভে ঠেকায়।'[৬]

দেশবাসীর সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্তির জন্য সংকীর্ণ স্বার্থ বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে কবি মনে করতেন। এই আত্মত্যাগের মনোভাব দেশবাসীর মধ্যে জাগরিত করার জন্য নজরুল যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, তার আরও একটি নিদর্শন হল *ধূমকেতু*-র তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে নজরুল বন্দিনী দেশমাতার দুর্দশার করুণ চিত্র অঙ্কন করে ভারতমায়ের সন্তান অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশমাতৃকার এই দুর্দশা দেখেও দেশবাসীদের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্ভব না হলে অথবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভয়ে যারা নিজেদের দেশপ্রেমকে অবহেলা করে, সেই দেশবাসীদের উপরে দৈব-আঘাতের প্রার্থনা করেছেন তিনি। তিনি এই প্রবন্ধে লেখেন, 'কোথায় আঘাতের দেবতা! আঘাত কর তাদের যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। অবমানিত হয়ে

যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হয়ে অশ্রুজল নির্গত হয় তাদের আঘাত কর, আঘাত কর হে আঘাতের দেবতা। মারো তাদের বুকে মুখে পিঠে—মারো তাদের। জাগাও তাদের আত্মসম্মান। পৌরুষ তাদের হুঙ্কার দিয়ে পড়ুক অত্যাচারের বুকে।'[৭] এভাবেই নজরুল প্রবল সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের মুখে দেশবাসীকে কঠিন হস্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তাদেরকে মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি প্রদান করেছিলেন।

এই একই সংখ্যায় নজরুল 'আগড়ুম বাগড়ুম' নামক প্রবন্ধে লয়েড জুরজ-র একটি মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতবাসীর কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। লয়েড জুরজ বলেছিলেন যে, 'ভারত চিরকাল আমাদের পা চাটবে আর আমাদের ঐ গণ্ডাকতক চুনোপুঁটী মিলেই তাদের চুটিয়ে শাসব করব।' জুরজ সাহেবের এই মন্তব্যের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের প্রকৃত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়েছিল। তাই ব্রিটিশ সরকারের ভারতবাসীদের স্বরাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করার প্রকৃত সত্যটিও স্পষ্ট হয়েছিল। সেই জন্য স্বরাজের আশায় বসে থাকা নেতৃবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার যে প্রতারণার খেলা খেলছিল তাকে ব্যঙ্গ করে নজরুল লেখেন ব্রিটিশরা বলতে চান 'তোমাদের স্বরাজ দেব তোমরা আগে সাবালক হও। যেটা বরাবর আউড়িয়ে এসেছে আর কি! কিন্তু তাঁদের চোখে আমরা যেন চিরকাল নাবালক হয়েই আছি এবং থাকবও অর্থাৎ কিনা এমন দেশের সেরা দেশ তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না এ ত আমরা সকলেই জানি।'[৮] বস্তুত স্বরাজ অর্জনের জন্য সমকালীন ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করতেন কিন্তু তাঁদের স্বরাজ সংক্রান্ত ধারণা পরস্পরবিরোধী ছিল।

স্বরাজ সম্পর্কে নজরুলের ধারণা

ধূমকেতু-র পরের সংখ্যায় নজরুলের 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে নজরুল 'স্বরাজ' কথাটির নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'স্বরাজ মানে, নিজেই নিজের রাজা বা সবাই রাজা, আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোন ভয়কে পরোয়া না ক'রে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে, নইলে নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'আমার রাজা আমি' বাণী বলবার সাহস আছে কোন বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর—যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে ভিতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার মুক্ত। যার এমন কোন গুরু বা বিধাতা নাই যাকে বা ভক্তি ক'রে সে নিজের সত্যকে

ফাঁকি দেয়, শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম-জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অহঙ্কার নয় এ হচ্ছে আপনার ওপর—নিজের বিপুল শক্তির ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস।[৯] তাই নজরুল মনে করতেন স্বরাজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য তাদের কাছে চাইবার বিষয় নয়। ভারতবাসীকে স্বরাজ অর্জন করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাসের জাগরণ। ভারতবাসীদের আত্মশক্তির ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা না থাকলে তারা কোনোদিনও স্বরাজ অর্জন করতে পারবে না। ভারতবাসী এই আস্থার অভাবের কারণেই ক্লীবত্ব লাভ করেছে, তারা ব্রিটিশ সরকারকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, তাই তারা পরাধীন। এই আত্মশক্তির অধিকারী না হয়ে ভারতবাসী যদি স্বরাজ অর্জন করতে চায়, তাহলে তারা উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবে। এই অবমাননার হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে তাই নজরুল লেখেন, 'শিবকে জাগাও, শিবকে জাগাও, আপনাকে চেন বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই ... ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে।'[১০] ভারতবাসীকে সেই বিদ্রোহ করার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। দেশবাসীর মধ্যে ত্যাগের মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দেশবাসীকে দেশের মুক্তির স্বার্থে আত্মবলিদান দেওয়ার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই *ধূমকেতু*-র নবম সংস্করণে 'মেয় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধে দেশমাতার মুক্তির জন্য দেশের দস্যি ছেলেদের আত্মাহুতির প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসিত ভারতবর্ষকে শ্মশানের সঙ্গে তুলনা করে লেখেন 'দস্যি ছেলেরা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু নাই। শুধু অনন্ত প্রসারিত শ্মশান, তার মাঝে পাগলী বেটী ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রুধির আপনি পান করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে 'মেয় ভুখা হু, মেয় ভুখা হু'। অমনি তরুণের দল হুঙ্কার করে উঠল, বেটি রক্ত চায়। মহা উৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে—তারা রক্ত-যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হল মায়ের ছেলেরাই।'[১১]

এই পত্রিকার পুজো সংখ্যায় নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতা প্রকাশ করেন। কবিতাটিতে তিনি পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নামে যে চূড়ান্ত শোষণ চলছিল তার বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। স্বাধীন স্বর্গসম দেশ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ নামক চণ্ডালদের অধীনস্থ হয়েছিল। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ এক অত্যাচারের ক্ষেত্রবিশেষে পরিণত হয়েছিল যেখানে বীর যুবকদের ফাঁসি দেওয়া এক অতিসাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল। নজরুল এই অবিচারের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে এক 'কসাইখানা'-র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবর্ষের সমকালীন নেতৃবর্গের মধ্যে গান্ধিজি, অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনকে তিনি ত্রিদেবের সঙ্গে

তুলনা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের শান্তির পথে এই অত্যাচার শোষণের অবসান ঘটতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সেই জন্য তিনি লেখেন—

'শান্তি শুনে তিক্ত এ-মন কাঁদছে আর ক্ষিপ্ত রবে
মরা দেশে মরা-শান্তি সে ত আছেই, কাজ কি তবে,
শান্তি কোথায়? শান্তি কোথায় কেউ জানি না
মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা!'[১২]

তাই তিনি সংহারিণী মূর্তি ধারণ করে দনুজদলনী মা কালীকে আহ্বান করেন অর্থাৎ একমাত্র ধ্বংসের পথে, সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। এই সময় নজরুলের লেখায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে কোনোরকম আপস মীমাংসার প্রচেষ্টার প্রতি আপত্তি প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। সেই জন্য কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির অসারতা উল্লেখ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতি অনুগত ভীরু ভারতবাসীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন তিনি—সে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিটিশ শাসকদের মন্ত্রণা দেওয়া হোক বা দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণকারী সাধারণ মানুষই হোক, সকলেরই তিনি নিন্দা করেছিলেন। একই সঙ্গে দেশের দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে মগ্ন ধর্মীয় নেতৃবর্গকেও নজরুল সমালোচনা করেছিলেন তাই তিনি লেখেন—

পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পুজে কিন্তু ডান্ডা-গুঁতো।
দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাই কো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্দী-গড়ে।'[১৩]

এভাবে ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থার তাৎপর্য সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন যে, পরাধীন দেশের প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হল দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। বাকি সমস্ত ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে মগ্ন থেকে পরাধীন দেশে দেশকে ভুলে থাকা পাপের অতিরিক্ত কিছু নয়। সেই সঙ্গে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে দেশমুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বোঝানোর জন্য মা দুর্গার সঙ্গে আসা লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক ও নির্বিকার মহাদেবকে ছাড়াই আনন্দময়ী মা-কে ছিন্নমস্তা মা কালী বেশে আহ্বান করেছেন। দেবীকে দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে আত্মত্যাগের মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ সন্তানদের রক্তে অর্ঘ দেওয়ার অঙ্গীকার করে দেবীর সত্যিকারের আগমনী উদ্‌যাপন করার

প্রতিশ্রুতি দিয়ে নজরুল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘাতের জন্য প্রস্তুতির আভাস দিয়েছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন।

ধূমকেতু-র পরের সংখ্যায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংখ্যায় নজরুল 'ধূমকেতুর পথ' নামক প্রবন্ধে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। তিনি লেখেন, 'সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।' এই প্রসঙ্গে নজরুল স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীদের অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।'[১৪] নজরুল জানতেন যে, এই প্রকৃত স্বাধীনতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছ থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাদের কাছ থেকে এই স্বাধীনতা ভিক্ষা হিসেবে চাইলে কোনোদিনও তা অর্জন করা যাবে না। তাই বিদ্রোহের ডাক দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তারা শুনবে না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে বিদ্রোহ করতে হবে সকল কিছু নিয়ম কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে আপনাকে চিনতে হবে, বুক ফুলিয়ে বলতে হবে 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ'।' তবে এই প্রবন্ধে নজরুলের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক পরিপক্কতা লক্ষ করা যায়। তিনি *ধূমকেতু* পত্রিকার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দিশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে বলেন, দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আনার জন্য দেশবাসীকে নিজের কাছে সৎ হতে হবে। সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতামত মানা না-মানার ক্ষেত্রে নজরুল দেশবাসীকে নিজ নিজ বিবেকের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'তা সে মহাত্মা গান্ধীর মত হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মত হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দরই মত হোক, আমি সত্যকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। এবং এই 'মানি না' কথাটা সকলের কাছে মাথা উঁচু ক'রে স্বীকার করে নিতে হবে।'[১৫] নজরুল মনে করতেন যে, এই কথাটা স্বীকার করে নিতে না পারলে, তা মিথ্যাচারণ হবে। সেই মিথ্যাচারণের পথে চললে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও এই

আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি লেখেন, 'যদি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর, তাই বল বুক ফুলিয়ে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরেজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরও বেড়েই চলবে।'[১৬] বস্তুত নজরুল মনে করতেন সমকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গ স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কর্মপ্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন, তার মধ্যে গলদ ছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে স্বরাজ সংক্রান্ত দাবি প্রাধান্য পেয়েছিল, যা কোনো ভাবেই পূর্ণ স্বাধীনতার সমগোত্রীয় ছিল না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি বলেছিলেন, ' 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' পেলেই তিনি 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়িয়ে দেবেন।' এমনকি কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে মওলানা হসরত মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুললে গান্ধিজির তীব্র বিরোধিতায় তা পাস হয়নি। অরবিন্দ ঘোষ 'অটোনমি' ও 'সেল্ফ গবর্নমেন্ট'-এর সমর্থক ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, 'ভগবান যদি একই সঙ্গে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতা' তাঁর হাতে এনে দেন তবে তিনি 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-কেই বেছে নেবেন।' নজরুল এই চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন, তাই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। বস্তুত নজরুলই প্রথম সাহিত্যিক যিনি বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন এবং জাতীয় নবজাগরণের পূর্বশর্ত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, তার সংকল্প জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই 'বিদ্রোহের বাণী' কবিতায় তিনি লেখেন—

'আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ,
এই দুলালাম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।'[১৭]

নজরুল দেশকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশচেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই স্বাধীনতার প্রতি ধারণার বিষয়ে দেশের তৎকালীন নেতৃবর্গের সমালোচনাও করেছিলেন। স্বরাজকামী নেতৃবর্গের সমালোচনা করে 'বিদ্রোহের বাণী' কবিতায় লেখেন—

'বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসীর'—এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।'[১৮]

এই সমস্ত প্রবীণ নেতৃবর্গ তাঁদের প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা অনুসরণ করে যে পথে দেশকে পরিচালিত করতে চান, তা দেশকে ক্লীবত্ব প্রদান করছে বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই নেতৃবর্গের দ্বারা দেশের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময়

দেশের মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে না। নবীনদের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যারা ভীরুতা বিসর্জন দিয়ে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আনার জন্য সত্যের পথে পরিচালিত হবে, স্বার্থপূরণের মোহে তারা স্বরাজের কথা বলে দেশের মানুষকে প্রতারণা করবে না। তাদের লক্ষ্যের কথা নজরুল এই কবিতায় নির্দেশ করে বলেছিলেন—

'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু চুপ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।'[১৯]

অর্থাৎ বিপ্লব-বিদ্রোহকেই কবি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে মুক্তির পথ বলে মনে করেছিলেন। সেই হিংসাত্মক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বলিদান আবশ্যক হবে, তার ভয়কে উপেক্ষা করেই পূর্ণ স্বাধীনতা আনার জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। *ধূমকেতু*-র চতুর্দশ সংখ্যায় নজরুল 'কামাল' নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপমা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। তুর্কি নেতা কামাল পাশার বন্দনা করে লেখা এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'দাড়ি রেখে, গোস্ত খেয়ে, নামাজ রোজা করে যে খিলাফৎ উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না তা সত্য—মুসলমান কামাল বুঝেছিল ... সে দেখল যে, বাবা! যত পেল্লাই দাড়িই রাখি আর উঠবোস করে যতই পেটে খিল ধরাই, ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হাইদরী হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্রষ্টার পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই।'[২০] তুরস্কের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কামাল পাশার নেতৃত্বে এই লড়াইয়ের প্রসঙ্গ টেনে নজরুল ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে লেখেন, 'তাই বলি কি ভাইরে ... সোজা 'হল বলরাম স্কন্ধে' অজামিলের যত বন্ধু ঘাড়ে তুলে বেড়িয়ে পড়।' এর পাশাপাশি *ধূমকেতু*-র এই সংখ্যাতেই 'মুসলিম জাহান' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে কামাল পাশার ভাষণ ছাপানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে আফগানিস্থানের বিদ্রোহী নেতা গাজী আনোয়ার পাশার কাছে 'ইত্তেহাদ-ই-ইসলাম'-এর পাঠানো আবেদনপত্রের অনুসরণে ভারতের সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটির প্রস্তাব পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করা হয়।

ধূমকেতু-র পরবর্তী সংস্করণে আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেন্ট-এর নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে কলহন মিশ্র লেখেন সকল দেশের মুক্তির পথের যাত্রী আমাদের নমস্য। অর্থাৎ নজরুলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই *ধূমকেতু* পত্রিকা সমকালীন

বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের কথা ভারতের পরাধীন দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিল অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য। তাই আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহের কথা যেমন ধূমকেতু-তে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনই এই পত্রিকার ষোড়শ সংস্করণে 'বিদ্রোহী ভারত' শিরোনাম যুক্ত প্রতিবেদনে বলশেভিক পররাষ্ট্র প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি পুস্তকের কথাও জানানো হয়। এই পুস্তকের প্রচ্ছদে লেখা ছিল 'ভারত ভারতবাসীদের জন্য'। এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয় যে, 'এই পুস্তকের এক জায়গায় লেখা আছে: ''আমরা রাশিয়ার বিদ্রোহীগণ ও আন্তর্জাতিক সোশালিষ্টগণ ভারত বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করলে কেবল যে তাকে সাদরে অভিনন্দন দও গ্রহণ করব তা নয়, বরং পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে সাধ্যমত ভারতের বিদ্রোহকে সহায়তা করব এবং ঘৃণিত ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত আজাদ করবার জন্য ভারতবাসীকে সাহায্য করব''।[১১] অর্থাৎ ধূমকেতু পত্রিকায় সরাসরি বিদেশি রাষ্ট্রের, বিশেষত রাশিয়ার পুঁজিবাদ বিরোধী বিদ্রোহীদের সহায়তায় ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের জন্য সহায়তার আশ্বাস প্রকাশিত হয়।

নজরুল এভাবে ধূমকেতু পত্রিকায় প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা প্রচার করতে থাকায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের কাছে শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে যান এবং তাঁর কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং ২০ ডিসেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন।[১২]

কাজী নজরুল ইসলামই ছিলেন প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার জন্য কারাবাস করতে হয়েছিল। কবির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহের মামলা করেছিল। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে যখন রায়দান করা হয়, সেই সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য নজরুল যে লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল করেছিলেন, তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে প্রবন্ধাকারে ধূমকেতু-র শেষ সংস্করণে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। নজরুল এই জবানবন্দীতে ব্রিটিশ বিচারপতি সুইনহো-র সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে সত্যের পথে চলার, ন্যায়নীতির পথে চলার সমর্থনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্য স্বরূপ।[১৩]

এভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিটি

প্রতিবাদকে তিনি এই কারণেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা স্বয়ং একটি মূর্তিমান অন্যায়, তা সত্যের বিরোধিতা করেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি শাসনব্যবস্থা। ব্রিটিশ বিচারপতিকে নজরুল আদালতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষাতে শুনিয়েছিলেন এবং বিচারককে একথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যে, ধর্ম ও ন্যায়ের বিচারে তিনি নিরপরাধ। তিনি যা করেছেন, তা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধী হলেও তা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতার দম্ভে সেই সত্যকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করতে পারলেও চিরকাল তারা এই সত্যকে উপেক্ষা করতে পারবে না। সেই সঙ্গে নজরুল ব্রিটিশ বিচারপতিকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চূড়ান্ত পরিণতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের মধ্যেই লেখা আছে। বিচারপতি সুইনহো-কে তিনি সত্যের অনুপস্থী হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিচারপতি সত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজ-আনুগত্য পালনে ব্যস্ত হয়েছিলেন, তার জন্য কবি বিচারপতিকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেছিলেন। এই কারণেই তিনি তাঁর জবানবন্দীতে লিখেছিলেন যে, 'বিচারক জানে আমি যা বলছি, যা লিখছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।'[২৪]

নজরুলের এই বক্তব্যের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আইনগত ভিত্তিকে কঠোর প্রশ্নের সম্মুখীন করার প্রয়াস ছিল। নজরুল ব্রিটিশ উপনিবেশের আইনব্যবস্থাকে সত্য ও ন্যায়-নীতি বিরোধী বলে অভিহিত করেছিলেন। পরাধীন ভারতে ভারতবাসী যে ব্রিটিশ আইনের অধীন হতে বাধ্য হয়েছিল, তার মধ্যে নজরুল কোনো কিছুই ইতিবাচক খুঁজে পাননি। সেই আইনব্যবস্থার প্রতি ভারতবাসীদের একটি অংশের, বিশেষত অভিজাত কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভরসা থাকলেও, নজরুল স্পষ্টভাবেই এই ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থাকে ন্যায়বিরোধী, সত্যবিরোধী বলে সমালোচনা করেছিলেন। এর পাশাপাশি নজরুল তাঁর এই বিবৃতিতে *ধূমকেতু* পত্রিকায় যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন তার সপক্ষে বলেন ভারতের পরাধীনতা সম্পর্কে, ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করার কাজকে রাজদ্রোহ তথা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হলেও, সেই সত্য কোনোভাবে আড়াল করা যাবে না। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশবাসীকে অজ্ঞানতার অন্তরালে রাখার প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা করলেও, তারা কোনোদিনও ওই কাজে সফল হবে না। নজরুল মনে করতেন যে, মানুষের বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন, এই বিষয়টি বিচারপতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নজরুল বলেন, নজরুলের স্থানে যদি বিচারপতি সুইনহো থাকতেন এবং ইংল্যান্ড পরাধীন হত তাহলে বিচারপতি সুইনহো নিশ্চয়ই নজরুলের

কথাগুলিই বলতেন। পরাধীন ভারতবর্ষের কাছে নজরুলের এই জবানবন্দী নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদাহরণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার রক্তচক্ষুকে এইভাবে উপেক্ষা করার ঘটনা সাধারণত বাংলার কোনো কবি-সাহিত্যিকের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মেলানো যায় না। এই ধরনের কাজ করার সাহস ও দৃঢ়তা দেশসেবায় নিয়োজিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের পক্ষেই করা সম্ভব বলে যেখানে মনে করা হয়, সেখানে নজরুলের এই কাজ নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সঙ্গে নজরুলকে এক আসনে বসানোর দাবি রাখে।

কারারুদ্ধ নজরুলের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা

বিচারে কাজী নজরুল ইসলামের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইনহো মোকদ্দমার রায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ নং ধারা অনুসারে নজরুলকে এই সাজা দিয়েছিলেন। তবে কারারুদ্ধ করেও নজরুলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি ইংরেজ সরকার। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কারাগারের প্রচলিত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নজরুল সরব হয়েছিলেন। সে সময় ব্রিটিশ জেলে আটক থাকা রাজনৈতিক বন্দী ও সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তা সত্ত্বেও নজরুল আটক থাকাকালীন রাজনৈতিক বন্দীদেরকে সাধারণ বন্দীদের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসার সরকারি অপেচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি অনশন আন্দোলন করেছিলেন। টানা ৩৯ দিন অনশন করে নজরুল এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন।

নজরুল বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে মাদারিপুরের শ্রী পূর্ণদাসের আলাপ হয়েছিল। এই পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুরের মাদারিপুর পার্টির নেতা। তিনি ও তাঁর দল ব্রিটিশ সরকার বিরোধী গুপ্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালাতেন। তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে *মেকিং অফ পান্নালাল* (Making of Pannalal) গ্রন্থে বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্তের সম্পর্কে আনন্দ সেনের দেওয়া একটি তথ্যের থেকে জানা যায়—'According to the account provided by Ananda Sen, who knew PD, during PD's childhood days in village the influence of the revolutionary group acting as a gang of dacoits led by Purna Das (1889-1956) was quite formidable. It was because at that time this group had a very strong base in Faridpur, especially in Madaripur. Besides, these revolutionary

groups, in order to augment organizational strength, had been engaged in secret competition for enlisting new young members from amongst school and college going students'।[২৫]

শ্রী পূর্ণদাস কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে নজরুল লিখেছিলেন 'পূর্ণ অভিবাদন' কবিতাটি। নজরুল তাঁকে 'মাদারিপুরের মনীষী' নামে অভিহিত করে তাঁর জয়গান গেয়েছিলেন। নজরুল তাঁর চারণদলের মাধ্যমে স্বদেশি চেতনা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে প্রচার করার জন্য একটি নাটক লিখেছিলেন। সেই চারণদল 'শান্তিসেনা চারণদল' নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য পাওয়া যায় যে, হুগলি জেলে বন্দী থাকাকালীন সাপ্তাহিক *বিজলী* পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য নজরুলের যে 'জাত-জালিয়াত' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এই অপ্রকাশিত নাটক থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তবে এই তথ্যটিকে মুজফ্ফর আহমদ গ্রহণ করেননি। কবিতাটির ফুটনোটে এই কবিতার উৎস হিসেবে নাটকটির কথা বলা হলেও তিনি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার চোখে ধুলো দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফুটনোটের বিষয়টি আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, কারণ নজরুল জেলে থাকাকালীনই কবিতাটিকে *বিজলী* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গোপনে পাঠানো হয়েছিল। তবু এই বিতর্কিত বিষয়টি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই সময় জেলে থাকাকালীন নজরুল ইসলামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তাভাবনা ক্রমশ পরিপক্ক ও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বদেশচেতনা, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের উন্মাদনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করাই যথেষ্ট নয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দিতে না পারলে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেক মুক্ত করা সম্ভব হবে না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের আর্থসামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনা যে প্রয়োজন, তা নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন। এই পরিবর্তন যে আবশ্যক তা নজরুল মনে করতেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করতে হলে প্রথমে সামাজিক স্তরে পরিবর্তন আনা দরকার। সেই পরিবর্তনের পথ ধরেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসানের জন্য পরিচালিত রাজনৈতিক সংগ্রাম সফল হবে। সুতরাং একথা বলা চলে যে জেলে থাকাকালীন নজরুলের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তাভাবনা আরও গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

নজরুলের এই উপলব্ধি তাঁর *ধূমকেতু*-র মতো পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশচেতনা

প্রসারের ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করে তোলে। সাধারণ দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর কাছে স্বদেশচেতনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি একদিকে যেমন ভিন্ন ধরনের পত্রিকার কথা পরিকল্পনা করতে থাকেন তেমনই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার অনুকূলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এই সময় নজরুল ইসলামকে বাংলার প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক সম্মেলনেই আমন্ত্রিত হতে দেখা যেত। এই সম্মেলনগুলিতে গিয়ে নজরুল নিজের কবিতা ও গানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশিবাদের অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণাত্মক প্রচার চালাতেন। তাঁর এই প্রচারকার্যের প্রধান মাধ্যম অবশ্য ছিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টির মুখপত্র *লাঙল* পত্রিকা।

লাঙল পত্রিকায় নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তার প্রাধান্য

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শামসুদ্দিন হুসায়ন, কুতুবুদ্দিন আহমেদ, হেমন্ত সরকারকে নিয়ে দ্য লেবার স্বরাজ পার্টি অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস[২৬] বা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। এই নবগঠিত দলটির ইস্তাহার রচনা করেন নজরুল ইসলাম। তাতে বলা হয় যে, শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করবে এই দল। এই দলের মুখপত্র ছিল *লাঙল* এবং তার প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। *লাঙল*-এর প্রথম সংখ্যাতেই ঘোষণা করা হয় ইস্তাহারটি, তাতে নজরুল ঘোষণা করেন 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।'[২৭] এই ইস্তাহারটির উপরে একটি স্কেচ ছিল যাতে দেখানো হয় যে, একটি শ্রমজীবী মানুষ ধনী মহাজনের হাতের মুঠোয় পিষ্ট হচ্ছে, মহাজনের আঙুলের ফাঁক দিয়ে শ্রমিকের রক্ত বিন্দু ঝরে পড়ছে মহাজনের অন্য হাতের তালুতে আর সেই রক্ত টাকাতে পরিণত হচ্ছে। এই স্কেচটির নীচে কাজী নজরুলের চার লাইনের কবিতা লেখা ছিল:

পেট-পোরা তার রাক্ষসী ক্ষুধা
ধনিক সে নির্মম;
দীনের রক্ত নিঙাড়িয়া করে
উদর ভূধর-সম।[২৮]

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি লেখেন, 'জমিতে চাষীর সত্ত্ব নাই, যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার

লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি, কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এই সমস্ত সমস্যা আপনি দূর হবে।'[২৯] স্বরাজ অর্জনের যে দাবি *ধূমকেতু* পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল তুলেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেও নজরুলের চিন্তাধারা আরও গভীরতা অর্জন করেছিল এই সময়। তাই *লাঙল* পত্রিকার সারথি নজরুলের কাছে 'কাদের স্বরাজ?' এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের সংখ্যাগুরু দরিদ্র সাধারণ মানুষের স্বরাজ না মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত মানুষদের স্বরাজ—এই প্রসঙ্গটি কারাগার ফেরত নজরুল ইসলামের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। তাই *লাঙল* পত্রিকার এই প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল লেখেন, 'এই 'স্বরাজ' এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর আটর্নি দিয়ে করাতে চাই না। এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে।'[৩০] অর্থাৎ দরিদ্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থে যাতে স্বরাজ অর্জিত হয় তা দেখার দায়িত্ব নজরুল তাদেরই দিতে চেয়েছিলেন এবং এই কাজে তার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তিনি *লাঙল* পত্রিকাকে ব্যবহার করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তাই *লাঙল* পত্রিকার উদ্দেশ্যর মধ্যে বলা হয় 'আমাদের দেবতা যিনি তাঁকে বৃন্দাবনের শ্যামল মাঠে ফিরিয়ে আনতে চলেছি, তিনি রাখালগণের সখা, তিনি গোধন চড়াতে ভালবাসেন .... যদি সেই দেবতার আবাহনে কেউ বাধা দেন তবে আমাদের হলধর ঠাকুর তাকে রাখবেন না—লাঙলের আঘাতে তাকে মরতেই হবে।'[৩১]

লাঙল-এর এই সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি *লাঙল* পত্রিকায় বিভিন্ন উপশিরোনামে বিভক্ত 'সাম্যবাদী' শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে ছিল—'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি মজুর'। এই সমস্ত কবিতাতেই কাজী নজরুল ধনী-নির্ধন, জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষে-মানুষে বিভেদ শুধু বাহ্যিক আচরণের মধ্যেই দেখা যায়। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যাবতীয় বাহ্যিক পার্থক্য মিটিয়ে দেওয়ার যে অপার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকে নজরুল ইসলাম বাস্তবায়িত করতে তৎপর হয়েছিলেন।

'ঈশ্বর' কবিতায় তিনি জগদীশের সন্ধানে মগ্ন মানুষকে ধর্মীয় ভেদাভেদ থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের অন্তরে ঈশ্বর-আল্লার অনুসন্ধান করতে বলেন। সেই অনুসন্ধানে মানুষকে ধর্মগুরুরা যে ভুল পথে পরিচালিত করেন, শাস্ত্রব্যাখ্যার নামে তারা মানুষকে ভুল তথ্য প্রদান করেন, তার যথার্থ ব্যাখ্যা নজরুল এই কবিতার মাধ্যমে দেন। তিনি

এই তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করার অধিকারের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন এই কবিতায়। তিনি বলেন এই শাস্ত্রবিদেরা তো 'খোদার খোদ্ প্রাইভেট সেক্রেটারী' নয়। এই শাস্ত্রজ্ঞদের অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার জন্য নজরুল তাই লেখেন—

শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদদের ক'রোনাক বীর ভয়,—
তাহারা খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'ত নয়।
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অ-দেখা জন্মদাতারে চিনি।[৩২]

শাস্ত্রবিদেরা ছাড়া মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারবে না এমন কোনো শর্ত থাকার যৌক্তিকতাকে খারিজ করে কবি বলেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, তাই তাঁর সন্ধান মানুষের মধ্যে করাই যথেষ্ট। তাই রত্নাকরের খোঁজ রত্নবেনেদের কাছে না করার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে চেয়ে 'ঈশ্বর' কবিতায় লিখেছিলেন—

রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু কূলে—
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছোনা ওদের ভ'লে।
উহারা রত্ন-বেণে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে।

'মানুষ' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম মানুষের মানবিক পরিচয়টিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মানুষের ধর্ম, জাতিভিত্তিক পরিচয় যে মূল্যহীন, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি মন্দির ও মসজিদে দরিদ্র মানুষের অবমাননার উপমা প্রদান করে মোল্লা পুরোহিতদের দুষ্টাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। একই সঙ্গে ধর্মগ্রন্থের অপ্রয়োজনীয়তার কথাও নজরুল বলেছেন। মানুষের জন্য গ্রন্থ, গ্রন্থের জন্য মানুষ নয়—এই সহজ কথাটাই তিনি তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। নজরুল ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে লেখেন—

যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পুজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! মূর্খেরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।[৩৩]

বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণকে মানুষের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করে নজরুল বোঝাতে চান যে মানুষের মধ্যে ধর্ম-জাতিভেদ থাকতে পারে কিন্তু সেই ভেদাভেদকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের অবমাননা করলে, তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই অবমাননা। সমাজের অবহেলিত

তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষদের প্রতি সমমর্যাদা প্রদানের জন্যও কবি তাদের মধ্যে শিবের অনুসন্ধান করেছেন। চণ্ডালের মধ্যে হরিশচন্দ্রের, মাঠের সাধারণ রাখাল ও মেষের রাখালের মধ্যে ব্রজের গোপাল ও নবীদের থাকার সম্ভাবনা তিনি উল্লেখ করে মানুষের মন থেকে এই অতিসাধারণ দরিদ্র মানুষদের প্রতি ঘৃণা দূর করার চেষ্টা করেন।

তিনি সাম্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, দেশীয় মহাজন, জোতদারদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় আর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়—এই সত্যটি নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। সেই উৎপীড়নের উপমা দিয়ে তিনি বলেন সমাজে প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা শ্রমিক মজুরদের মানুষ বলেই মনে করে না। কুলি-মজুরদের সঙ্গে ধনী প্রতিপত্তিশালী মানুষদের এই বিভাজন, এই অসাম্য নজরুলের লেখায় বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অসাম্য ছিল সামাজিক অসাম্য, যা অর্থনৈতিক ক্ষমতার পার্থক্যের কারণে বৈধতা লাভ করেছিল সমকালীন ভারতীয় সমাজে। অর্থশক্তির বিনিময়ে ধনীরা দরিদ্রদের উপরে যে কোনো শোষণ বৈধ করে তোলার যে কদর্য ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, তার সম্পর্কে শ্রমিক-মজুর-খেটেখাওয়া মানুষকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নজরুল গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি লেখেন—

যে দধীচির হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-সকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে!

একইভাবে নজরুল তাঁর 'চোর ডাকাত' কবিতাতে দেখিয়েছিলেন কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ধনিক শ্রেণির মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা শোষিত হয়ে চলেছে। তাই তিনি লেখেন—

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট-রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাস করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কল্‌ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।[৩৪]

দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় 'কৃষকের গান'। এই গানে তিনি শস্য-শ্যামল ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের উপরে বৈশ্যশ্রেণির শোষণের অতি করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দরিদ্র কৃষকদের আক্ষেপের মধ্য দিয়ে সেই শোষণকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই তিনি লেখেন—

(মোদের) সত্য ত্রেতা দ্বাপর জুড়ে ছিল না ভাই ক্লেশ,
(এই) দস্যু-যুগের লুঠতরাজে লাঞ্ছনার নাই শেষ,

লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ
মার কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল।...
চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
জোঁকের মত শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,...[৩৫]

ধূমকেতু-র নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শ্রমিকের গান। এই গানেতেও কবি শ্রমজীবী মানুষদের শোষক পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ কাজের হাতিয়ার নিয়ে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নজরুল তাদের ধ্বংসপথের যাত্রীদল রূপে গণ্য করেছিলেন এবং ধ্বংসের প্রতীক হাতুড়ি শাবল নিয়ে হিংসাত্মক বিপ্লবের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেও চিরলাঞ্ছিত হয়ে জীবনযাপন করে। নজরুল তাদের যাবতীয় শোষণের অবসানের জন্য বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানিয়ে লেখেন—

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এই বারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নতুন করে মল্লভূমে
গর্জ্জবে তাই দলমাদল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিভিয়ে আয়রে ধ্বংস-সাথী।

এই সময় নজরুল বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, দেশের সাধারণ মেহনতি মানুষই নতুন যুগে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করবে, শোষকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে তারাই সামাজিক জীবনের উপরে সকলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। নজরুলের এই ঘোষণার মধ্যে দিয়েও মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয় যখন তিনি 'কুলি মজুর' কবিতায় লেখেন—

'এই ধরণীর তরণীর হা'ল রবে তাহাদেরি বশে!
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথ চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ![৩৬]

লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ
মার কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল।...
চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
জোঁকের মত শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,...[৩৫]

ধূমকেতু-র নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শ্রমিকের গান। এই গানেতেও কবি শ্রমজীবী মানুষদের শোষক পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ কাজের হাতিয়ার নিয়ে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নজরুল তাদের ধ্বংসপথের যাত্রীদল রূপে গণ্য করেছিলেন এবং ধ্বংসের প্রতীক হাতুড়ি শাবল নিয়ে হিংসাত্মক বিপ্লবের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেও চিরলাঞ্ছিত হয়ে জীবনযাপন করে। নজরুল তাদের যাবতীয় শোষণের অবসানের জন্য বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানিয়ে লেখেন—

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এই বারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নতুন করে মল্লভূমে
গর্জ্জবে তাই দলমাদল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিভিয়ে আয়রে ধ্বংস-সাথী।

এই সময় নজরুল বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, দেশের সাধারণ মেহনতি মানুষই নতুন যুগে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করবে, শোষকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে তারাই সামাজিক জীবনের উপরে সকলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। নজরুলের এই ঘোষণার মধ্যে দিয়েও মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয় যখন তিনি 'কুলি মজুর' কবিতায় লেখেন—

'এই ধরণীর তরণীর হা'ল রবে তাহাদেরি বশে!
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথ চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!'[৩৬]

তবে নজরুল যখন *লাঙল* পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর রাজনৈতিক চেতনা অনেক বেশি পরিণত ও স্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। এই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, তার বিশ্লেষণ শুরু করেন নজরুল। এই সময় থেকেই স্বরাজ অর্জনের পথ সম্পর্কে তাঁর মতামত ক্রমশ গণভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পথের পক্ষে দৃঢ় হয়ে উঠছিল। *লাঙল* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'পলিটিক্যাল তুবড়ি বাজি' নামক প্রবন্ধে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন 'লাঙল ও চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পল্লী-সংগঠনের আয়োজন করতে হয়— লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট সম্পর্ক যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না।'[৩৭] নজরুল এই সময় স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করেন, যে শ্রমিক-কৃষকদের সংঘবদ্ধভাবে করা ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব হবে না। তিনি এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন, 'সাম্যবাদী দলের কনফারেন্সের সভাপতি ঠিকই বলেছেন যে, শ্রমিক-কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে কংগ্রেস বলহীন এবং সে কংগ্রেসের দ্বারা স্বরাজ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়েছে।'[৩৮]

কংগ্রেস দলের সাংবিধানিক রাজনীতির অসারতার ধারণা নজরুল তাঁর এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। এর বিকল্প পথ হিসেবে নজরুল জনসাধারণের হাতে আন্দোলনের ভার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছিলেন। বুর্জোয়া ভদ্র সম্প্রদায়ের হাতে এই নীতি নির্ধারণের ভার থাকলে চলবে না বলে তিনি মনে করতেন, কারণ এর মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত থেকে যাবে। জনসাধারণের হাতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা থাকলে তবেই সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সম্ভব হবে। তবে একথা ঠিক যে এই সময় নজরুল কংগ্রেস দলের ছত্রছায়া সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার কথা ভাবেননি, কারণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তথা পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের একমাত্র বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান তখনও গড়ে ওঠেনি। সেই কথা মাথায় রেখেই নজরুল কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে থেকেই গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। এই দলের মুখপত্র হিসেবে নজরুল প্রকাশ করেছিলেন *লাঙল* পত্রিকাটি। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল এর উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালী প্রকাশ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল—'নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক

ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।' এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথ হিসেবে স্পষ্টতই নজরুল গণ-আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। তাই দলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি লিখেছেন—'নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তির প্রয়োগ' প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নজরুল এই গণ-আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেশের সংখ্যাগুরু খেটেখাওয়া মানুষদের কথাই বলেছিলেন। তাই এই উদ্দেশ্যের মধ্যে তিনি লেখেন—'দেশের শতকরা আশিজন যাহারা সেই শ্রমিক ও কৃষক তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সহায়তা করা যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরো সচেতন হইয়া নিজেদের সমতার এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে।'[৩৯]

বস্তুত, *ধূমকেতু*-র নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ, দেশমাতার মুক্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে নিবেদিতপ্রাণ এক দেশপ্রেমী ছিলেন। বিপ্লব বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের দেশছাড়া করার মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক সক্রিয়তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই সে সময় তিনি দেশবাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করতেন। তারা যাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জীবনপণ রেখে লড়াই চালায়, তার জন্য নজরুল দেশবাসীকে অভয়মন্ত্র দান করেছিলেন। অর্থাৎ এই পর্যায়ে নজরুল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন কিন্তু *লাঙল* পত্রিকাতে লেখার সময় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তায় দেশবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার বিষয় সচেতনতা লক্ষণীয়। এই পত্রিকাতে নজরুল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও যে জরুরি, সে কথাই দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশ শাসকদের থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শোষকশ্রেণি অর্থাৎ জমিদার, জোতদার, মহাজনদের শোষণের থেকেও দেশবাসীকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই *লাঙল* পত্রিকায় নজরুল দেশবাসীর প্রকৃত মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন, যা ভারতবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই বলা যায় যে, নজরুলের লেখা *ধূমকেতু*-র তুলনায় *লাঙল*-এ বেশি গভীরতা অর্জন করেছিল এবং অনেক বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছিল। নজরুল *ধূমকেতু*-তে তীব্র দেশপ্রেমের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাতে বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ তেমনভাবে ঘটেনি। সেই বাস্তব রাজনীতিভিত্তিক চিন্তার প্রকাশ নজরুল করতে শুরু করেছিলেন তাঁর *লাঙল* পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে। এভাবে তিনি ক্রমশ আবেগঘন কল্পনার জগৎ থেকে রাজনীতির বাস্তব জগতে প্রবেশ করেন।

তথ্যসূত্র

১। বাঁধন সেনগুপ্ত, *নানা প্রসঙ্গে নজরুল*, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩০।

২। নজরুল ইসলাম কাজী, 'সারথির পথের খবর', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১১ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

৩। *তদেব*, পৃ. ৩-৪।

৪। *তদেব*, পৃ. ৪।

৫। নজরুল ইসলাম কাজী, 'জাগরণী', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

৬। নজরুল ইসলাম কাজী, 'কানার বোঝা কুঁজোর ঘারে', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

৭। নজরুল ইসলাম কাজী, 'রুদ্রমঙ্গল', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৮ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

৮। নজরুল ইসলাম কাজী, 'আগডুম বাগডুম', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৮ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩-৪।

৯। নজরুল ইসলাম কাজী, 'মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২২ আগস্ট, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

১০। *তদেব*, পৃ. ৪।

১১। নজরুল ইসলাম কাজী, 'মেয় ভুখা হুঁ', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

১২। নজরুল ইসলাম কাজী, 'আনন্দময়ীর আগমনে', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

১৩। *তদেব*, পৃ. ৩।

১৪। নজরুল ইসলাম কাজী, 'ধূমকেতুর পথ', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

১৫। *তদেব*, পৃ. ৩।

১৬। *তদেব*, পৃ. ৩-৪।

১৭। নজরুল ইসলাম কাজী, 'বিদ্রোহী বাণী', কাজী নজরুল ইসলাম। (www.banglainternet.com/pdf-legend/kazi_nazrul_islam_bisher_banshi.pdf.)

১৮। *তদেব*, পৃ. ২৩।

১৯। *তদেব*।

২০। নজরুল ইসলাম কাজী, 'কামাল', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৭ অক্টোবর, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৩।

২১। নজরুল ইসলাম কাজী, 'বিদ্রোহী ভারত', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, ষোড়শ সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর, ১৯২২, কলকাতা, পৃ. ৮।

২২। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম: *স্মৃতিকথা*, সং পঞ্চদশ, কলকাতা, পৃ. ১৭০।
২৩। নজরুল ইসলাম কাজী, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', *ধূমকেতু*, স. কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিত্রিংশতি সংখ্যা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৩, কলকাতা, পৃ. ৩।
২৪। *তদেব*, পৃ. ৩-৪।
২৫। Making of Pannalal (1908-2929), Chapter I (shodhganga.inflibnet.ac.in /jspui/bitstream/10603/154856/5/05_chapter%202.pd)
২৬। Priti Kumar Mitra, *The Dissent of Nazrul Islam*, New Delhi, 2009, p. 68.
২৭। নজরুল ইসলাম কাজী, 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়', *লাঙল*, স. মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ১১।
২৮। *তদেব*, পৃ. ১১।
২৯। নজরুল ইসলাম কাজী, 'লাঙল', *লাঙল*, স. মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৪।
৩০। *তদেব*, পৃ. ৪।
৩১। *তদেব*।
৩২। নজরুল ইসলাম কাজী, 'ঈশ্বর', *লাঙল*, *তদেব*, পৃ. ৫।
৩৩। নজরুল ইসলাম কাজী, 'মানুষ', *লাঙল*, *তদেব*, পৃ. ৬।
৩৪। নজরুল ইসলাম কাজী, 'চোর ডাকাত', *লাঙল*, *তদেব*, পৃ. ৭।
৩৫। নজরুল ইসলাম কাজী, 'কৃষাণের গান', *লাঙল*, স. মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষ, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৭।
৩৬। *তদেব*, পৃ. ১০
৩৭। নজরুল ইসলাম কাজী, 'পলিটিক্যাল তুবড়ি বাজি', *লাঙল*, স. মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষ, ২৩ পৌষ, ১৩৩২, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৫।
৩৮। *তদেব*, পৃ. ৫।
৩৯। নজরুল ইসলাম কাজী, *লাঙল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।